চলমান ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের চালচিত্র

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (৫ মে, ২০১৬)

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ২২ মার্চ, ৩১ মার্চ ও ২৩ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ধাপের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে ৭ মে, ২৮ মে ও ৪ জুন ২০১৬ তারিখে। এবারের নির্বাচনের বিশেষত্ব হলো, এই প্রথমবারের মত রাজনৈতিক দলভিত্তিকভাবে এবং দলীয় প্রতীকে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন কারণে এই নির্বাচন জনগণের দৃষ্টি কেড়েছে। কারণগুলোর মধ্যে ব্যাপক সহিংসতা ও প্রাণহানি, মনোনয়ন বাণিজ্যের ব্যাপকতা, রেকর্ড সংখ্যক ইউনিয়নে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়া, একটি বড় রাজনৈতিক দল কর্তৃক অনেক ইউনিয়নে প্রার্থী দিতে না পারা, এক দলকেন্দ্রিক ফলাফল, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হামলা-নির্যাতন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এক কথায় বলতে গেলে ব্যাপক অনিয়মের কারণে এই নির্বাচন এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ফলে ব্যাপক সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে। সমালোচনার মুখে পড়েছে সরকার ও রাজনৈতিকগুলোও, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

নির্বাচনী সহিংসতায় প্রাণহানি: স্বাধীন বাংলাদেশে ইতোপূর্বে আটবার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন চলছে নবম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। রেকর্ড পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অতীতের নির্বাচনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ বা খারাপ নির্বাচন ছিল ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। ঐ নির্বাচনে ৮০ জনের প্রাণহানি ঘটে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, এবার নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে এ পর্যন্ত নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী সংঘর্ষ এবং নির্বাচনকেন্দ্রিক বিরোধের জেরে এ পর্যন্ত ৭১ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। আহতের সংখ্যা ছয় সহস্রাধিক। প্রাণহানির তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রথম ধাপের নির্বাচনের পূর্বে ১০ জন, প্রথম ধাপের নির্বাচনের দিন ১১ জন, প্রথম ধাপের নির্বাচনের পর থেকে দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত ১১ জন, দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনের দিন ৯ জন, দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনের পর থেকে তৃতীয় ধাপের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত ১৭ জন, তৃতীয় ধাপের নির্বাচনের দিন ৫ জন, তৃতীয় ধাপের নির্বাচনের পর থেকে এ পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিভাগভিত্তিক প্রাণহানির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বরিশাল বিভাগে ১৬ জন, ঢাকা বিভাগে ১৬ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৩ জন, খুলনা বিভাগে ১০ জন, রাজশাহী বিভাগে ৮ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৭ জন এবং রংপুর বিভাগে ১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। সিলেট বিভাগে কোনো প্রাণহানি ঘটেনি। জেলাভিত্তিকভাবে দেখা যায়, মোট ৩৩টি জেলায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। অধিক সংখ্যক প্রাণহানির দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে পিরোজপুর (৭ জন), যশোর (৬ জন), চট্টগ্রাম (৫ জন), পটুয়াখালী (৪ জন), গাজীপুর (৪ জন), বগুড়া (৪ জন), মাদারীপুর (৪ জন), কক্সবাজার (৩ জন) ও ময়মনসিংহ (৩ জন)। এছাড়াও নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, বান্দরবান, পাবনা ও ঢাকা জেলায় ২ জন করে এবং কুষ্টিয়া, মাগুরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, রংপুর, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, নোয়াখালী, জামালপুর, শেরপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা ও বরিশাল জেলায় ১ জনের করে প্রাণহানি ঘটেছে।

দলগত পরিচয়ের দিক থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী বা সমর্থক ২৯ জন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী বা সমর্থক ৭ জন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২ জন, জাতীয় পার্টির ১ জন, জাতীয় পার্টি- জেপি'র ১ জন, জনসংহতি সমিতির ১ জন, মেম্বার প্রার্থীর কর্মী বা সমর্থক ১৫ জন এবং ১৬ জন সাধারণ মানুষ রয়েছেন প্রাণহানির তালিকায়। মৃতদের মধ্যে ২ জন নারী ও ২ জন শিশুসহ প্রার্থী ও সম্ভাব্য প্রার্থীও রয়েছেন। চেয়ারম্যান প্রার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ২৮ জন, মেম্বার প্রার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ১৭ জন, পুলিশের গুলিতে ১৪ জন এবং বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনী বিরোধের জেরে ১২ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। চেয়ারম্যান প্রার্থীদের মধ্যে সংঘটিত ২৮টি ঘটনার মাত্র ৩টি ঘটেছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে, একটি ঘটেছে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির মধ্যে, একটি ঘটেছে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি-জেপি'র মধ্যে এবং কমপক্ষে ২১টিই ঘটেছে আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী বা স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে। উল্লেখ্য, তৃতীয় ধাপের নির্বাচনের দিনে (২৩ এপ্রিল ২০১৬) নিহত ৫ জনের মধ্যে ২ জন নির্বাচনকালীন, ২ জন নির্বাচনোত্তর এবং ১ জন নির্বাচনপূর্ব (পরবর্তী ধাপের নির্বাচনী প্রচারকালে) সহিংসতায় প্রাণ হারিয়েছেন। দুটি মৃত্যুর ঘটনা ২৪ এপ্রিলের সমকালে এবং ৩টি ২৫ এপ্রিলের প্রথম আলোতে প্রকাশিত হয়েছে।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়া ও দলীয় প্রার্থী না থাকা: চেয়ারম্যান পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি ইতোমধ্যেই সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়েছে। ইতোপূর্বে ১৯৮৮ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ ১০০ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন বলে জানা গেছে। প্রথম ধাপ থেকে শুরু করে চতুর্থ ধাপের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ও প্রত্যাহারের পর এই সংখ্যা ১৫০-এ দাঁড়িয়েছে। প্রথম ধাপে ৫৪ জন, দ্বিতীয় ধাপে ৩৪ জন, তৃতীয় ধাপে ২৯ জন এবং চতুর্থ ধাপে ৩৩ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এরা সকলেই ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী।

অপরদিকে চার ধাপে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীশূন্য ছিল বা আছে মোট ৩৮৮টি ইউনিয়নে। প্রথম ধাপে ১১৯, দ্বিতীয় ধাপে ৭৯ এবং তৃতীয় ধাপে ৮১টি ইউনিয়নে বিএনপি'র প্রার্থীশূন্য ছিল। চতুর্থ ধাপেও ১০৯টি ইউনিয়নে বিএনপির প্রার্থী নেই বলে জানা গিয়েছে। অনেক স্থানে ভয়-ভীতি প্রদর্শন, মনোনয়নপত্র জমাদানে বাধা প্রদান, মনোনয়নপত্র কেড়ে নেওয়া বা ছিঁড়ে

ফেলার কারণে বিএনপি প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি। কেউ কেউ মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও চাপ সৃষ্টির কারণে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন। ছোট-খাটো বা সংশোধনযোগ্য ত্রুটির কারণে যাচাই-বাছাই কালে বাতিল হয়ে গেছে অনেকের মনোনয়নপত্র। পাশাপাশি এটাও জানা গিয়েছে যে, অনেক ইউনিয়নে বিএনপির পক্ষ থেকে কেউই দলীয় মনোনয়ন চাননি। অনেক ইউনিয়নে বিএনপি নেতৃবৃন্দ স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন।

ভোট পড়ার হারে অস্বাভাবিকতা: ইউপি নির্বাচনে অস্বাভাবিক হারে ভোট পড়ারও অভিযোগ উঠেছে কোথাও কোথাও। যেমন, খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন বেলছড়ি ইউনিয়নে ১৯৬% ভোট পড়ার খবর ছাপা হয়েছে গণমাধ্যমে। গত ২৭ এপ্রিল ২০১৬, মানবজমিনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বেলছড়ি ইউনিয়নে মোট ভোটার ৩১২৮জন। ভোট পড়েছে ৬১৩৫টি; যা মোট ভোটারের ১৯৬%। অবশ্য নির্বাচন কমিশন থেকে বিষয়টিকে অবিশ্বাস্য বলে, খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার চন্দননগর ইউপিতে ভোট পড়েছে ১০৭%। মোট ভোটার সংখ্যা ১৯ হাজার ৩১০। ভোট পড়েছে ২০ হাজার ৬৯৪টি, যা মোট ভোটারের ১০৭ ভাগ।

তিন ধাপে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার:

পর্যায়	ইউপির সংখ্যা (টি)	প্রদত্ত ভোটের হার (শতকরা)	প্রদত্ত ভোটের হার (শতকরা)			
			৭০-৮০%	৮০-৮৫%	৮৫-৯০%	৯০-১০০%
প্রথম ধাপ	৭১২	৭৪	২৫০টি	১২৭টি		৬টি
দ্বিতীয় ধাপ	৬৩৯	৭৬	তথ্য পাওয়া যায়নি			
তৃতীয় ধাপ	৬১৪	৭৭		১৭৫টি	৯৬টি	৭টি

তথ্যসূত্র: মানবজমিন, যুগান্তর

এক দলকেন্দ্রিক ফলাফল: গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এ পর্যন্ত ঘোষিত ১৯৬২টি ইউনিয়নের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১,৩৭৯টি (৭০.২৮%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১৬৮টি (৮.৫৬%) এবং স্বতন্ত্র ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল ৪১৫টি (২১.১৫%) ইউনিয়নে জয়ী হয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে তুলনা করলে নির্বাচনের ফলাফলে অনেক ফারাক পরিলক্ষিত হয়। নিকট অতীতের নির্বাচনগুলোর সাথে তুলনা করলে এই ফলাফলকে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয় (*প্রথম আলো*, ৯ এপ্রিল ২০১৬)। ধাপভিত্তিক ফলাফলে দেখা যায়, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপে আওয়ামী লীগ যথাক্রমে ৭৪.৫৮% (৭২৪টির মধ্যে ৫৪০টি), ৭০.৭০% (৬২৮টির মধ্যে ৪৪৪টি) এবং ৬৪.৭৫% (৬১০টির মধ্যে ৩৯৫টি) ইউনিয়নে জয়ী হয়েছে। অপরদিকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল যথাক্রমে ৬.৪৯% (৭২৪টির মধ্যে ৪৭টি), ৯.৭১% (৬২৮টির মধ্যে ৬১টি) এবং ৯.৮৩% (৬১০টির মধ্যে ৬০টি) ইউনিয়নে জয়ী হয়েছে। স্বতন্ত্র ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপে যথাক্রমে ১৮.৯২% (৭২৪টির মধ্যে ১৩৭টি), ১৯.৫৮% (৬২৮টির মধ্যে ১২৩টি) এবং ২৫.৪০% (৬১০টির মধ্যে ১৫৫টি) ইউনিয়নে জয়ী হয়েছে। উপরোল্লেখিত ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ফলাফল ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখী হলেও, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং স্বতন্ত্র ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ফলাফল কিছুটা হলেও উর্ধ্বমুখী। অনেকেই মনে করেন যে, নির্বাচনের দিনে অনিয়ম ও নির্বাচনী সহিংসতার নিম্নমুখী প্রবণতার সাথে ফলাফলের বিষয়টির সামঞ্জস্যতা রয়েছে; যদিও ফারাক অনেক বেশি।

মনোনয়ন বাণিজ্য: দলভিত্তিক নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়ন একটি সাধারণ রীতি। নির্বাচনী আইনানুযায়ী অতীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই রীতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র সংসদ নির্বাচনেই প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগ উঠে। কিন্তু প্রথমবারের মত এবার স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে ব্যাপক মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। অধিকাংশ এলাকায় স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের বিরুদ্ধে উঠেছে এ অভিযোগ। ইতোমধ্যেই আওয়ামী লীগের স্থানীয় পর্যায়ের নেতা কর্মীরা চট্টগ্রাম, সিলেট, সিরাজগঞ্জ, খুলনা ও কুমিল্লাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে সংবাদ সম্মেলন ও মানববন্ধন করে মনোনয়ন বাণিজ্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন বলে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

মনোনয়ন বাণিজ্যের কারণে একদিকে আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গন কলুষিত হচ্ছে, অন্যদিকে তৃণমূলের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটির জনকল্যাণমূখী ভূমিকা পালনের সম্ভাবনাও বিনষ্ট হচ্ছে। কেননা, জনকল্যাণে নিবেদিত হওয়া সত্ত্বেও অনেক ভালো মানুষ সম্পদশালী না হওয়ায় মনোনয়ন পাচ্ছেন না। এদের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনোনয়ন পাচ্ছেন আদর্শহীন, দলছুট, পেশিশক্তির অধিকারী, বিত্তশালী ব্যক্তিরা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিএনপি ও জামায়াত এমন কি জেএমবি সদস্যকেও দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার গোয়ালকান্দি ইউনিয়নে জেএমবির সদস্য ও বাংলা ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী আব্দুস সালামকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে এবং জেএমবি সদস্য হিসেবে যার নাম গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিশের তালিকায় রয়েছে বলে

জানা গিয়েছে। জানা যায় যে, তৃণমূলের মতামত ছাড়াই জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব এনামুল হককে ম্যানেজ করে তিনি মনোনয়ন পেয়েছেন (সমকাল, ৩ মে, ২০১৬)। উল্লেখ্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই তার মনোনয়ন পত্র বাতিলসহ তার সদস্য পদ বাতিল করা হয়েছে।

শুধুমাত্র আওয়ামী লীগেই নয়, বিএনপিতেও মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে। দেশের উত্তরাঞ্চলীয় একজন সাবেক উপমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জমি দলিল করে নেওয়ার বিনিময়ে মনোনয়ন প্রদানের অভিযোগ উঠেছে। বিএনপির কোনো কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে নির্বাচনে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। শোনা যায় যে, প্রার্থী যে পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছিলেন, তার চেয়ে অধিক পরিমাণ অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কাছ থেকে পেয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছেন।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা-নির্যাতন ও ভয়ভীতি প্রদর্শন: দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে, বিশেষ করে বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় নির্বাচন পরবর্তীকালে যে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার শিকার হয়েছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়। বাগেরহাটের চিতলমারী ও ফকিরহাট এবং বরিশালের বানারীপাড়া, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া ও উজিরপুরের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলার পাশাপাশি বাড়িঘর ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি ঘটনা ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অথবা আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীদের কর্মী-সমর্থকদের মাধ্যমে ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পরাজিত মেম্বার প্রার্থীর সমর্থকরাও কোথাও কোথাও এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন। যেখানেই আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীরা হেরে গিয়েছে, তারাই ভোট না দেওয়ার অভিযোগে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা চালিয়েছে। অতীতে জাতীয় নির্বাচনের সময় এই ধরনের ঘটনা ঘটলেও কোনো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এবারই প্রথম ব্যাপক হারে এই ঘটনা ঘটছে। এ নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে একটি অনুষ্ঠানে ক্ষোভ প্রকাশ করে বক্তব্য রাখতে দেখা গিয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনকে দেশত্যাগের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এদিকে জানা গেছে যে, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন যশোরের অভয়নগর উপজেলার মালোপাড়ায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ১৫১টি জেলে পরিবারে বিভৎস হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে আনোয়ার সর্দার, তার বড়ভাই সর্দার বাবুল আক্তারকে প্রেমবাগ ইউনিয়নে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। সেই হামলাকারীরা এখন বলছে, তাদেরকে ভোট না দিলে, 'কেটে ভৈরব নদে ভাসিয়ে দেওয়া হবে'। ফলে আবারও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে মালোপাড়ায় (*ইত্তেফাক*, ৩ মে ২০১৬)। কিন্তু সরকার, নির্বাচন কমিশন বা ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক ভয়াবহ এই ঘটনাগুলোকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে কি না, জানা যায়নি। আমরা মনে করি যে, ২০০১ সালের নির্বাচনের পর থেকে শুরু করে অতীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্বাচনোত্তর যে হামলার ঘটনাগুলো ঘটেছে, তার বিচার করা হলে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হলে, এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতো না। অতীতে হামলাকারী হিসেবে অভিযোগ উঠতো বিএনপি-জামায়াতের বিরুদ্ধে। এখন সেই জায়গা দখল করেছে আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্টরা।

মনোনয়ন প্রদানে নারীদের উপেক্ষা: দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কথা বলে আসছে। এছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৯০বি ধারায় বলা হয়েছে, ২০২০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সব স্তরে ৩৩ শতাংশ নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আমরা তার উল্টো চিত্র দেখছি। বড় দু দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বিএনপিতে নারীদের চেয়ারম্যান প্রার্থী করার হার ১ শতাংশেরও কম। প্রথম দু দফায় আওয়ামী লীগ মাত্র ১২ জন এবং বিএনপি মাত্র ৬ জনকে চেয়ারম্যান প্রার্থী করে। স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট-এর তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৭ সালের ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে নারী ১০২ জন প্রার্থীর বিপরীতে জয়ী হন ২৩ জন। ২০০৩ সালে ২৩২ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন ২২ জন। সর্বশেষ ২০১১ সালের নির্বাচনে ২২৬ জন প্রার্থীর বিপরীতে জয়ী হন ২৩ জন।

এবারের নির্বাচনে এ পর্যন্ত ১৪ জন নারীর চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হওয়ার তথ্য পাওয়া গিয়েছে। প্রথম ধাপে নির্বাচিত ৮ জনই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এই ৮ জনের মধ্যে ৫ জনই বিনা প্রতিদ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। দ্বিতীয় ধাপে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে ৩ জন এবং ১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। তৃতীয় ধাপে বিজয়ী ২ জনের মধ্যে একজন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে এবং একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন।

চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিজয়ী নারী সংখ্যা

পর্যায়/দফা	ইউপি'র সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বী (জন)	বিজয়ী (জন)	দলভিত্তিক পরিসংখ্যান				
				বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল		স্বতন্ত্র
				প্রতিদ্বন্দ্বী (জন)	বিজয়ী (জন)	প্রতিদ্বন্দ্বী (জন)	বিজয়ী (জন)	
প্রথম	৭১২	৬২	৮	৮	৮	৬	০	০
দ্বিতীয়	৬৩৯	১০	৪	৪	৩	০	০	১
তৃতীয়	৬১৫	জানা যায়নি	২	জানা যায়নি	১	জানা যায়নি	০	১

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, প্রথম আলো, ২০ এপ্রিল ২০১৬ ও মানবজমিন, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ১২ জন নারী চেয়ারম্যানের মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতরা হলেন, ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলাধীন সিদ্ধকাঠি ইউনিয়নে জেসমিন আক্তার, বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলার সনাইলতলা ইউনিয়নে মর্জিনা বেগম, চিতলমারী উপজেলার সন্তোষপুর ইউনিয়নে বিউটি আক্তার, ফকিরহাট সদর ইউনিয়নে শিরিন আখতার এবং মোড়েলগঞ্জ উপজেলার তেলিগাতি ইউনিয়নের মোরশেদা আক্তার। প্রথম ধাপের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে যে ৩ জন বিজয়ী হয়েছেন, তারা হচ্ছেন বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলার রাঢ়ীপাড়া ইউনিয়নে তাসলিমা বেগম, পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি উপজেলাধীন দৈহারী ইউনিয়নে প্রগতি মণ্ডল এবং মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদীখান ইউনিয়নে সানজিদা আক্তার। দ্বিতীয় ধাপে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ৩ জন হচ্ছেন– যশোর জেলার নওয়াপাড়া সদর ইউনিয়নে নাছরিন সুলতানা ও রামনগর ইউনিয়নের নাজনীন নাহার এবং কুষ্টিয়া জেলার বাহিরচর ইউনিয়নে রওশন আরা বেগম। তৃতীয় ধাপে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত নারী চেয়ারম্যান হলেন সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলাধীন রাজাপুর ইউনিয়নের মোছাঃ ছনিয়া সবুর।

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রথম ধাপে নির্বাচিত হয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলাধীন পূর্ব নবীনগর ইউনিয়নের মৌসুমি আক্তার এবং তৃতীয় ধাপে নির্বাচিত হয়েছেন মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া সদর ইউনিয়নের নার্গিস আক্তার বুবলি।

অন্যান্য নেতিবাচক অনুষঙ্গসমূহ: উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হওয়া তিনটি ধাপের নির্বাচনে একই ধরনের চালচিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রতিটি ধাপের নির্বাচনের পূর্বেই প্রতিপক্ষের এজেন্টদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে না দেওয়া বা ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া; বুথ দখল করে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ভরা; চেয়ারম্যান প্রার্থীর ব্যালটে প্রকাশ্যে ভোট দিতে বাধ্য করা; নির্বাচনী কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যালট পেপারে সিল মারা বা সিল মারতে সহায়তা করা; ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের কারণে তিন ধাপে মোট ১৩৯টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়। কোনো কোনো ইউনিয়নে নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে।

নির্বাচনে ব্যাপক সহিংসতা ও প্রাণহানি; মনোনয়ন বাণিজ্যের ব্যাপকতা; রেকর্ড সংখ্যক ইউনিয়নে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়া; একটি বড় রাজনৈতিক দল কর্তৃক অনেক ইউনিয়নে প্রার্থী দিতে না পারা; একতরফা ফলাফল; সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা-নির্যাতন ও ভয়ভীতি প্রদর্শন; ফলাফল পাল্টে দেওয়া; অস্বাভাবিক হারে ভোট পড়া ইত্যাদি প্রতিটি নেতিবাচক অনুষঙ্গকেই আমরা অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য চালেঞ্জ বলে মনে করি। এই চ্যালেঞ্জগুলো সফলভাবে মোকাবেলা করা না গেলে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের প্রত্যাশা কখনই পূরণ হবে না।

দলভিত্তিক নির্বাচন ও আমাদের আশঙ্কা: আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে প্রথম থেকেই বিভিন্ন কারণে দলভিত্তিক নির্বাচনের বিরোধিতা করে আসছিলাম। একইসাথে দলভিত্তিক নির্বাচনের নেতিবাচক প্রভাবসমূহ সম্পর্কে আশঙ্কাও প্রকাশ করে আসছিলাম। আমাদের বক্তব্য ছিল– রাজনৈতিক দলভিত্তিক স্থানীয় সরকার নির্বাচন বিরাজমান দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাবকে গ্রামাঞ্চল তথা ঘরে ঘরে বিস্তৃত করবে। নির্বাচনের পূর্বেই রাজনৈতিক দলসমূহ নিজেদের মধ্যেই দলাদলিতে জড়িয়ে পড়বে। মনোনয়ন বাণিজ্যের বিস্তৃতি তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে এবং সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের পরিবর্তে অর্থ ও পেশিশক্তির অধিকারীরা অধিকহারে মনোনয়ন পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। দলগতভাবে জয়লাভের মরিয়া প্রচেষ্টায় নির্বাচনী সহিংসতা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল কর্তৃক যে কোনো মূল্যে জয়ের আকাঙ্ক্ষাও অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে। দলীয়করণের প্রভাবের কারণে দায়িত্ব পালনে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা দেখা দেবে। কর্তব্য পালনে সাহসের অভাব ও নির্বাচনী অনিয়ম কঠোরভাবে দমন করতে না পারার ব্যর্থতায় কমিশনের বিরুদ্ধে সক্ষমতা ও পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ, এমনকি নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। নির্বাচনের চালচিত্র দেখে মনে হচ্ছে যে, আমরা আগে থেকেই যে আশঙ্কাগুলো প্রকাশ করে আসছিলাম, তা অনেকাংশেই সত্যে পরিণত হয়েছে।

নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রতি সুজন-এর পূর্বের আহ্বান: আমরা সুজনের পক্ষ থেকে শুধু শঙ্কাই প্রকাশ করিনি, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিতকরণে নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের বিশেষ করে নির্বাচন কমিশন, সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা ও করণীয় সম্পর্কে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলাম। নির্বাচন কমিশনের প্রতি আমাদের আহ্বান ছিল সাহসিকতা ও নিরপেক্ষতার সাথে আইনি দায়িত্ব কঠোরতার সাথে যথাযথভাবে পালন করার। একইসাথে কমিশনকে নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল যে, **একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কমিশন সরকারসহ নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকে যদি যথাযথ সহযোগিতা না পায়, তবে কমিশন তা সহজভাবে মেনে নেবে না। সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে সরকারসহ সকলের সহযোগিতা পাওয়া না গেলে, প্রয়োজনে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব থেকে কমিশন সরে দাঁড়াবে।**

সরকারের প্রতি আমাদের আহ্বান ছিল, একটি নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানে সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনকে যেন সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয় এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হয়। একইসঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে মন্ত্রীগণ-সহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা যাতে নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলেন, নির্বাচনী প্রচারণা থেকে বিরত থাকেন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত

না করেন, সে ব্যাপারে তাদেরকে যেন সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়। **পাশাপাশি যেন এই মর্মে হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয় যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করলে এবং নির্বাচনী দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**

রাজনৈতিক দলের প্রতি আমাদের আহ্বান ছিল, রাজনৈতিক দলগুলো যেন নির্বাচনী আচরণবিধিসহ নির্বাচনী আইন-কানুন যথাযথভাবে মেনে চলে। তারা যেন মনোনয়ন বাণিজ্যের মনোভাব পরিহার করে, সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের মনোনয়ন দেন। দলীয় সংসদ সদস্যগণ নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে যেন কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 'যে কোনো মূল্যেই জয়ী হওয়া'– এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে তারা যেন নির্বাচনকে প্রতিযোগিতার মনোভাব থেকে গ্রহণ করে।

ইতোপূর্বে সুজন-এর পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশন, সরকার ও রাজনৈতিক দলের প্রতি উপরোল্লেখিত আহ্বানসহ বেশ কিছু আহ্বান জানানো হলেও, বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে আমলে নেওয়া হয়নি। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা উল্টো ফলাফল লক্ষ করেছি। আমরা গণমাধ্যম সূত্রে জানতে পেরেছি যে, নির্বাচন কমিশনের আদেশে গত ২০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে গাজীপুরের পুলিশ সুপারকে গাজীপুর থেকে পুলিশ সদর দপ্তরে প্রত্যাহার করে নেওয়া হলেও, গত ৩ মে ২০১৬ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আগের আদেশটি বাতিল করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তৃতীয় ধাপে গাজীপুরের ২০টি ইউনিয়নে ভোট গ্রহণকে সামনে রেখে তিনি ১৯ এপ্রিল বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে কোন ইউনিয়নে কে বিজয়ী হবেন সেটা তিনি আগাম বলে দেন। এ নিয়ে অন্য প্রার্থীদের কোনো ধরনের প্রতিবাদ না করতে শাসিয়ে দেন। উল্লেখ্য, নির্বাচন শেষে তিনি গাজীপুরের এসপি হিসেবেই পুনর্বহাল হবেন।

এদিকে তৃতীয় ধাপের নির্বাচনের পূর্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পক্ষ থেকে নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি কঠোরভাবে আইন প্রয়োগের আহ্বান জানানো হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকেও অনিয়ম ও সহিংসতামুক্ত এবং সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনে বার্তা পাঠানো হয়েছিল। আমরা মনে করি, নির্বাচন কমিশনের প্রতি একদিকে কঠোর হওয়ার আহ্বান এবং অপর দিকে সরকারের পক্ষ থেকে কমিশনের আদেশকে উপেক্ষা করা যেমন চরম বৈপরীত্যমূলক, তেমনি তা নির্বাচন কমিশনের জন্যন অবমাননাকরও বটে। নির্বাচন পরিচালনাকালে নির্বাচন কমিশনের আদেশ যদি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হয়, তবে সেই নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা কখনই সম্ভব নয়।

আমাদের বিশ্বাস, আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সরকার, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলসহ নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই যদি যথাযথ ভূমিকা পালন করতো, তবে এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এতোটা প্রশ্নবিদ্ধ হতো না। বিরাজমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় পূর্ব থেকেই যথেষ্ট সতকর্তা অবলম্বন না করলে, দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব তৃণমূল পর্যন্ত পৌঁছাতে বাধ্য, যা এই নির্বাচনে হয়েছে। রাজনৈতিক দলসমূহের সুস্থধারার রাজনীতি চর্চার মধ্য দিয়েই সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে। আর সুস্থধারার রাজনীতি সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রধানতম পূর্বশর্ত। তাই, একদিকে যেমন অব্যাহত চর্চার মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে হবে, পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে উপরোল্লিখিত চ্যালেঞ্জসমূহ সঠিকভাবে মোকাবিলাও করতে হবে। তবেই একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নিশ্চিত করা সম্ভব।